জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প : মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ

মাখন চন্দ্র রায়*

Abstract

This research aims to explore the correlation between the urbanization process of capital city Dhaka and "Dhakai" language" spoken by the commoners of the old part of Dhaka. According to the historical description, people migrated from the outskirt areas of Mughal Dhaka and created a home-grown version of Dhakai language. The study finds that this linguistic form is highly influenced by a range of regional dialects, especially Bikrampuri and it stimulates the obscured history of the commoners. In fact, compare to Sukhobashi form (based on Urdu language), Dhakai language is used by non-elite, marginalized people who in reality stay outside of the all kinds of socio-political power framework. As a result, linguistic features of Dhakai language provide interesting information and cues regarding their lives and activities which are not taken place in the conventional history.

সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) প্রতিভার বিচিত্রগামী প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকালেই স্বকীয়তায় ছিল উজ্জ্বল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তু বাঙালি জীবনের পরিচিত পরিবেষ্টনীতেই সামাজিক ও ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের পরিধিতে প্রসারিত হয়েছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় এই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি, অধিত বিদ্যা ও অর্জিত জ্ঞান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কথাসাহিত্যে যে রূপ-রূপান্তর পরিলক্ষিত হয় তা যতটা না অর্থনৈতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। বস্তুত এই যুদ্ধ বাংলার সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক অভিঘাত নিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে প্রবলতর হয়েছিল মূল্যবোধের বিপর্যয় ও মানবিক বিপন্নতা। সমাজের বহুমাত্রিক জটিলতায় অস্তিত্বের সংশয় ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নরনারীর মনোজীবন, তাদের বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের জগৎ, আবহমান মূল্যবোধ ক্রমশ অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে এই কলুষিত রাজনীতি ও অবক্ষয়িত কর্মকাণ্ডের চিত্র। যুদ্ধোত্তর কালের মানস অবক্ষয়ের এই চিত্রায়ণ নিছক যুগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার দর্পণরূপে সীমিত থাকেনি, তা হয়ে উঠেছিল সমাজমনস্ক শিল্পীর জীবনের গূঢ় বাস্তবতাবোধের চিরায়ত দলিল। জীবনের প্রতি বিশিষ্ট আগ্রহ ও বিচিত্র বীক্ষাই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যকীর্তিকে স্বাতন্ত্র্যের গৌরব দান করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী স্বকীয় জীবনানুভবের আলোকে মানবিক ঐশ্বর্যের অবিনাশী শক্তিরই সন্ধিৎসু স্রষ্টা ও প্রযত্নশীল শিল্পী। 'শিল্পীজনোচিত এক আশ্চর্য নিরাসক্তিতে জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অবশ্যই প্রশংসার্হ।'[১] যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগের ফলে আঘাতপ্রাপ্ত মূল্যবোধে অবধারিতভাবেই জন্ম দিয়েছিল তীব্র অবক্ষয়। আর এই অবক্ষয় ব্যক্তিক পর্যায়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল আত্ম-প্রবঞ্চনা ও ব্যক্তিক বিচ্যুতি রূপে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের নীচতা, স্বার্থপরতা দেশ-শাসনে বিশৃঙ্খলা ও দায়িত্বহীনতা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নীতিহীনতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'চরণদাস এম-এল-এ' গল্পটি। এ গল্পে দেশসেবার নামে রাজনৈতিক নেতার ভণ্ডামিকে লেখক নির্মম

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। সাধারণ ভোটারদের দৃষ্টিকোণ থেকে চরণদাসের মতো নেতাদের ছবি এঁকেছেন তিনি। খামখেয়ালি প্রতাপশালী 'হাইকম্যান্ড'-এর নির্দেশ ও পদস্খলনের ভয়ে বছর চারেক পরে নিজের ভোটকেন্দ্রে আসে চরণদাস। দীর্ঘকাল রাজনীতি করা চরণদাস সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে গিয়ে এক অপ্রত্যাশিত অদৃশ্য দূরত্বের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়। পূর্বের পরিচিত লোক তাকে দেখে চিনতেই চায় না। পার্টির কর্মচারীরা বিদ্রূপ করে, সর্বোপরি তিনি যে এখানকার একজন তা যেন স্বীকার করতেই চায় না কেউ। ফলে চরণদাসের মনে প্রশ্ন জাগে :

> কেউ তাকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখ-দুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম বোম, আবহাওয়া, ফসলের অবস্থা– প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোনো কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত দিল না। কারও কিছু চাইবার নেই? ছেলের চাকরি, বাস চালাবার অনুমতিপত্র, রাস্তায় মাটি ফেলবার ঠিকা, সরকারি লোন, সিমেন্ট, বন্দুকের লাইসেন্স, মেয়ের বৃত্তি?[২]

জনসাধারণের সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার পন্থা অনুসন্ধান করতে থাকে সে। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সূত্র আবিষ্কৃত হয়। পুরনো জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে ও বিমুখ ভোটারদের অনুকূল করতে পরিশেষে ধর্মগুরু শ্রী সহস্রানন্দ স্বামীজীর শরণ নেন 'মায়েলজী'। অশিক্ষিত ভারতবাসীকে হয় রাজনৈতিক নেতা নয় ধর্মগুরু 'ভবের হাটে চুরি করতে' শিখিয়ে আসছে চিরকাল।[৩] তাই সকালে যাকে গলা ধাক্কা দিতে চেয়েছিল, ভোটারদের অনুকূল করতে 'মায়েলজী' বিকেলে সেই মৌলবি সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে কুণ্ঠিত হয় না। ভোটার চরণদাস গুরুচরণদাস হয়ে ভোট বৈতরণী অতিক্রম করার পরিকল্পনা করে। এম.এল.এ সাহেবের এই ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সদ্যস্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতির অভ্যন্তরের শূন্যতাকেই চিহ্নিত করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। এভাবেই তিনি অনাবৃত করেছেন স্বাধীন ভারতের নৈতিক অবনতির ইতিহাস।

'পত্রলেখার বাবা' গল্পে মানুষের অন্তর্লোকের জটিল রহস্য উন্মোচনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। দোলগোবিন্দ বাবুর মনোবিকারের বিশ্লেষণে লেখকের নৈপুণ্য অভূতপূর্ব। শুধু সমাজ নয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অসঙ্গতি আর বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে সময়ের অবক্ষয়িত রূপকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। গল্পটি শুরু হয় এভাবে :

> রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজানো আরম্ভ হল।
> 'শুরু হল!'
> 'হ্যাঁ-অ্যাঁ।'
> দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়।'[৪]

ক্ষুদ্র তিন বাক্যের মাধ্যমেই আড্ডার আসরে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। এদের মধ্যমণি পরছিদ্রান্বেষী দোলগোবিন্দবাবু বেনামী চিঠি লিখে পত্রপ্রাপকের অবস্থার কথা কল্পনা করে বা স্বচক্ষে দেখে অদ্ভুত আনন্দ পেত। অপরের কুৎসা রটনা ও চর্চায় দুর্বার আকর্ষণ তার। 'শিকারের' উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়া তাকে পৈশাচিক আনন্দ দিত। সমাজের কল্যাণার্থে পরকুৎসার দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিলাসে কত যে বেনামী চিঠি সে দিয়েছে তার সীমা নেই। হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করল তার কন্যা পত্রলেখা পাড়ার ছেলে নেপালের সঙ্গে প্রেমপত্র লেখালেখি

করে। ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে সে তার চির অভ্যাসের পথ বেছে নিল। মেয়ের চরিত্রের কুৎসা করে সে তার স্ত্রীকেই বেনামী চিঠি লিখতে বসল :

> কলমের নিব নেই। কলমের উল্টো দিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন। লিখছেন নতুন একখানা চিঠি, বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে, জীবনে স্ত্রীর কাছে এই প্রথম চিঠি লেখা।[৫]

শেষ পর্যন্ত নিজেরই দেয়া বেনামী চিঠির শিকার হয় তার স্ত্রী। কাহিনি বর্ণনার কৃতিত্ব ও লেখনির জাদুস্পর্শে অতি সহজেই সতীনাথ ভাদুড়ী মানবজীবনের গভীরতলের অনুভবকে ব্যঞ্জিত করেছেন। উপরিতলের লঘুতার গভীরে দোলগোবিন্দের অন্তর্জগতের প্রতি গল্পকারের সহানুভূতির প্রকাশ অভিনব।

মানব-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। মানবচরিত্রের আপাত বিচ্যুতি সমকালীন সামাজিক সমস্যাকেই অভিব্যঞ্জিত করে। 'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পে লেখকের অতীত স্মৃতিচারণায় নাটোয়ারলালের ব্যর্থতার করুণ বার্তা পরিবেশিত হয়েছে। নাটোয়ারলাল চা বাগানের মজুর মোর্চার মহিলা-ইন-চার্জ। স্ত্রীলোকের মন জয় করার ব্যাপারে তার সহজাত প্রতিভা ছিল ঈর্ষণীয়, ফলে কোনো অসামাজিক কার্যকলাপ কিংবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলো মীমাংসার জন্য মহিলা-ইন-চার্জ নাটোয়ারলাল নিজের পদ্ধতিতে মীমাংসা করে দিত। ঠাট্টার সূত্রে লেখক চলে গিয়েছিলেন অতীতে; সেখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহিলা-ইন-চার্জ নিজের স্ত্রীর কাছে হেনস্তা হয় :

> মরদ! ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোসাই। মোট কামিয়ে দারোগার বিবি হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। এখানে পুলিশের উর্দী পরে ছড়ি হাতে করে মদ্দানি ফলাস, তবে বিয়ে করা বউ-এর কাছে সাত বছরের মধ্যে যাস না কেন?[৬]

নাটোয়ারলাল এই দুর্বিপাক থেকে সেদিন পালিয়ে বেঁচেছিল। পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরা যার জন্য কাঁদে, সে নিজের স্ত্রীর মন পায় না– গল্পকারের কাছে এ এক বিস্ময়। নাটোয়ারলালের জীবনে এ এক চরম প্রহসন। নাটোয়ারলাল প্রকৃতপক্ষে এক মুক্তপ্রাণ মানুষ, বোহেমিয়ান ও সংসারবিমুখ ব্যক্তি। তাই 'আজ সে শহরের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দিন কাটায় তো কাল তাকে দেখা যায় ডুয়র্সের চা-বাগানের কুলি মেয়েদের মাঝে।'[৭] মানবমনের রহস্য অপার, কোথাও তা স্বচ্ছ, কোথাও ধূসরতায় আচ্ছন্ন। মনোগহনের গভীর তলে সতীনাথ ভাদুড়ীর এ এক গভীর অনুসন্ধান।

মানুষের ব্যক্তিচরিত্রের ভ্রান্তির গরমিল নিয়ে রচিত গল্প 'পদাঙ্ক'। সরকারি কলোনিতে বসবাসরত বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা দিয়ে গল্পটি আরম্ভ হলেও বয়স ও বিত্তের ব্যবধানে রেবা ও বোস সাহেবের মধ্যে অনিবার্য ব্যবধান গল্পের মূল আকর্ষণ। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ডক্টর বোস মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও ইংল্যান্ড যাবার সুযোগ পায়। উচ্চশিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে বড় চাকুরিতে যোগ দেয়। ইংল্যান্ড থাকাকালীন এক ইংরেজ নারীকে বিয়ে করলে তার আত্মীয় পরিজন তা মেনে নেয়নি। ফলে মেমসাহেবের সঙ্গেই শুরু হয় তার বিচ্ছিন্ন বসবাস। রেবার পিতা ড. বোসের অধীনস্ত কর্মচারী। ছোটবেলা থেকে অন্যদের মতো রেবারও বড়সাহেব ও মেমসাহেবের প্রতি কৌতূহল ছিল প্রবল। দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী হওয়ায় রেবাকে মেমসাহেব পছন্দ করত। মিসেস বোস মারা গেলে পত্নীবিয়োগ বেদনায় বোস সাহেব উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঘটনা পরম্পরায় ছন্নছাড়া

জীবন থেকে মুক্তির জন্য রেবাকে বিয়ে করে সে। একদিকে বয়স ও অভিজ্ঞতার ফারাক অন্যদিকে বিত্তের ব্যবধান পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝিতে রূপ নেয় এবং দুজনের মধ্যকার ব্যবধান বাড়তে থাকে। রেবা যখন মেমসাহেবার ন্যায় ব্যবহারের উদ্দীপনায় বিভোর, রেবার প্রৌঢ় স্বামী তখন ধরে বাঙালিয়ানা। হতাশাগ্রস্ত ডা. বোস পুনরায় মদ্যপান শুরু করে। অতিরিক্ত নেশা করে বিছানায় শুলে মেম সাহেব ডক্টর বোসকে ঠেলে ফেলে দিতো বিছানা হতে– এ কথা রেবার পূর্বেই জানা ছিল। রেবা একদিন তাই করল। তার স্বামী নেশার ঘোরে বিড় বিড় করে বলল– 'এমিলি তোমার গায়ে নারকেল তেলের গন্ধ কেন?'[৮] এই উক্তির মধ্য দিয়েই রেবা ও ডা. বোসের পারস্পরিক সান্নিধ্যে আসার ব্যর্থতাটুকু চমৎকারভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কারণ অনুকরণ করে তো স্বভাব বদলানো যায় না। কিছু অসঙ্গতি ডক্টর বোস ও নবযৌবনা রেবার মানসিক শান্তির ব্যর্থ অনুসন্ধান ও আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজ, সংস্কার ও সমকালজারিত সংকটের বীজ। অসম দাম্পত্যের বিচিত্র অসঙ্গতি এ গল্পের উজ্জ্বল দিক। বোস সাহেব যে রেবার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল দাপুটে এমিলির প্রতিচ্ছবি, বিয়ের পর সেই রেবার শান্ত ও নির্লিপ্ত আচরণে সে হতাশ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এমিলির মতো জুতা দিয়ে প্রহার না করলেও খাট থেকে সযত্নে সে ঘুমন্ত স্বামীকে ফেলে দিয়েছিল এমিলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

রাজনীতি-সচেতন শিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ অসাধুতা ভণ্ডামি আর নৈতিক অধঃপতনের চিত্র রূপায়ণ করেছেন 'জোড়-কলম' গল্পে। সরকারি রিপোর্টে দু-একটি শব্দের সংযুক্তির ফলে প্রচলিত আইনের অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের অপকর্মকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন লেখক। মফস্বল শহরের এক্সাইজ-সাবইন্সপেক্টর হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ক্রিমিনাল কোর্টের নাজির কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় দুজনেই সাধারণ ছাপোষা মানুষ। কায়ক্লেশে তাদের সংসার চলে উপরি রোজগারে। অভাবী নাজির বাবু তার কন্যার বিয়েতে নাজারতের সিন্দুকে রক্ষিত দাবিদারহীন গহনার সোনাটুকু কাজে লাগায়, অন্যদিকে তার বন্ধু হারানবাবু মদের দোকানে অবৈধভাবে গাঁজা বিক্রি করে। এক্সাইজ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শহরে এলে ঘটে যায় বিড়ম্বনা। ঘটনাচক্রে দুজনের অপকর্ম ধরা পড়ে যায় তাদের উর্ধ্বতনদের হাতে। কর্মতৎপর হারাণবাবু ও নাজিরবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের সেবার আতিশয্য ও তোষামুদিতে সন্তুষ্ট হয়ে সাহেব সামান্য ধমক দিয়ে এক্সাইজ-ইন্সপেক্টরকে তার রিপোর্টে 'সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া' কথাটি যুক্ত করে দিতে বলে। অন্যদিকে নাজির বাবুর ক্ষেত্রে 'গোল্ড' এর পূর্বে 'রোল্ড' শব্দটি জুড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। এর ফলে রক্ষা পায় হারাণ ও কৃষ্ণপদ। এভাবে সরকারি ব্যবস্থার অসাধুতা ও সঙ্গতিহীনতাকে তীর্যক ভাষায় তুলে ধরেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী।

'বয়োকমি' গল্পে আচরণের সাময়িক অসঙ্গতির মধ্যে নিহিত আছে সমাজসত্যের এক বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস। দুই বন্ধু আহ্লাদী ও অসীমার সংকটের দুই রূপের কেন্দ্র কিন্তু এক; বয়স কমানোর প্রবণতা :

> স্কুলে ভরতি হবার সময় আর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তার সময়, বয়স কমানোই নিয়ম। এরই জন্য ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারবে না? বয়স কমিয়ে লেখানোর মধ্যে যে এমন মারাত্মক ব্যাপার থাকতে পারে এ কথা আহ্লাদী কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এখন উপায়?[৯]

হায়ার সেকেন্ডারির পর ছেলে সিধুকে তাদের বাড়িতে রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্য আহ্লাদী এক রকম জোর করেই দাদা বৌদিকে রাজি করিয়েছিল। কিন্তু ভর্তি করাতে গিয়ে সমস্যা হলো সতের বছরের কম বয়সে তো সেখানে ভর্তি হওয়া যায় না। মূল বয়স আঠার হলেও কমানোর ফলে সিধুর বয়স তখন ষোল। এ ঘোর বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বন্ধু অসীমার স্বামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক এর কাছে তদ্বির করতে গিয়ে সমস্যা আরও গভীর হলো। বিয়ের জন্য অসীমার বয়স যে গোপন করা হয়েছে দশ বছর। কোনোভাবে তা প্রকাশ পেয়ে যায়– এই ভাবনার মধ্যেই নিহিত ছিল বাল্যসখীর সঙ্গে আচরণের অসঙ্গতির বীজ। আহ্লাদীর আর নিজের কথা বলাই হলো না। বরং ইঙ্গিতে অসীমার শাশুড়ীকে যখন সে জানালো অসীমা তার ছোট, তখন অসীমার কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকল না। বিদায় লগ্নে অসীমা যখন প্রণাম করল অসীমার আঙ্গুলের চাপটা একটু জোরে মনে হলো আহ্লাদীর; 'তার অভিনয়ের মজুরী বোধ হয়।' পথে ছেলের কাছে এই মজার গল্পটা বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল। এভাবে আপাতব্যঙ্গের পেছনে বাস্তব সমাজ-সত্যজারিত অসঙ্গতি বর্ণনার মধ্যেও অনুভব করা যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর সহানুভূতিশীল হৃদয়ের সুনিবিড় উষ্ণতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী তার অনন্য বর্ণন-কুশল প্রতিভার স্পর্শে অনেক চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। সহজাত মনন ও আশ্চর্য নিরাসক্ত হাস্যরসে তিনি সমাজকে চিনিয়ে দেন; চিনিয়ে দেন অসংলগ্ন ব্যক্তি চরিত্রকেও। 'শেষ সংখ্যান' গল্পে পরিসংখ্যানশাস্ত্র বিশারদ বাল্টিওয়ালা এমনই এক চরিত্র। একটি মফস্বল শহরে বীণাপাণি ক্লাব এর সারস্বত সম্মেলনে সভাপতি করা হয় বাল্টিওয়ালাকে। পাণ্ডিত্য প্রকাশে অতিতৎপর মি. বাল্টিওয়ালা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে 'শহরে কটি গাধা আছে' থেকে শুরু করে 'কটি গাছ আছে' এবং তার সামাজিক প্রভাব কি তার পরিসংখ্যান দিতে আরম্ভ করলেন। ফলে যে শ্রোতারা নাচ, গান, আবৃত্তি আর রঙ-তামাশায় অভ্যস্ত তখন তাদের আর বিরক্তির অন্ত থাকে না। চিরাচরিত রীতি ভেঙ্গে ভাবগম্ভীর এই সভায় দর্শক উপস্থিতি ছিল নগণ্য। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বাল্টিওয়ালা বিস্তর বলেই চলেন। শতকরা কতজন লোক ক-ছটাক করে মাছ খায় কিছুই যেন তার পরিসংখ্যান থেকে বাদ পড়ে না। বাল্টিওয়ালা বাবুর বর্ণনায় সমাজের বিভিন্ন বাস্তব অসঙ্গতির চিত্র ফুটে ওঠে। গল্পের শেষে অসাধারণ এক চমকের সৃষ্টি হয়। যখন শ্রীবাল্টিওয়ালার মতো মেধাবী পরিসংখ্যান বিশারদ নয়া পয়সার হিসেবে ভুল করে। ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সূক্ষ্ম রসিকতার মধ্যেই নিহিত ছিল বাল্টিওয়ালা বাবুর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রতি কৌতুক আর ব্যঙ্গপূর্ণ ইঙ্গিত।

'বৈয়াকরণ' গল্পে মানুষের মনোগহনের জটিল রহস্য উন্মোচনে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন লেখক। অগ্নিদগ্ধ যুবতী শালাজের মৃত্যুশয্যায় একটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তুরন্তলাল পণ্ডিতের আত্মসমীক্ষা এই গল্পের প্রতিপাদ্য। অগ্নিদগ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী শালাজ পণ্ডিতজির স্ত্রীকে যে কথা বলেছিল তা আজও তাকে তাড়া করে ফেরে– 'ওরা কি ওই চায়?' কারণ সমস্ত পুরুষজাতির ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিহিত ছিল এই শব্দগুচ্ছের অন্তরালে। চেতনাপ্রবাহরীতি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাকরণ পণ্ডিত তুরন্তলাল মিশ্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ গল্পটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে আসা হৃদয়-নিংড়ানো বাক্যটি তাকে অস্থির করে তোলে। কারণ বহু টীকাভাষ্যেও বোঝা গেল না, ঠিক কি মনে করে মহিলাটি 'ওরা' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। সামান্য এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জীবন সায়াহ্নে নিজেকে আবিষ্কার করলেন নতুন করে। চিন্তন চিহ্ন সমৃদ্ধ তুরন্তলালের

চিন্তাস্রোতের এই রূপায়ণ উদ্‌ঘাটিত করে দেয় তার মনোলোক, আলো ছিটিয়ে দেয় মনের গভীরে। 'ব্যক্তিগত জীবনে সংসার-বিবাগী লেখকের জীবনমুখীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'বৈয়াকরণ' গল্পটি।'[১০] আপাত কৌতুককর হলেও গল্পটিতে এই বৃদ্ধের আত্মসমীক্ষণ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাবহ। চরিত্র ও পরিবেশ রচনা, বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের হীনমন্যতা, কিশোরীদের পরিহাসপ্রিয়তা– সব মিলিয়ে সামষ্টিক পারিপার্শ্ব শুদ্ধাচারী পণ্ডিতের মনোবিশ্লেষণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। উর্দু শিক্ষক মৌলবি সাহেবের প্রৌঢ় বয়সে দার পরিগ্রহ, পক্বকেশ ও শ্মশ্রুমণ্ডলী রঞ্জিতকরণ অকৃত্রিম কামনা-বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ তার আপাতনিষ্ঠ জীবনের অন্তরালে আবিষ্কার করলেন আত্ম-প্রবঞ্চনার বীজ। সুশ্রী মালবিকার সঙ্গে তিনি সহজ হতে পারেন না, অথচ রূপহীনা লিলিকে তিনি বিনা দোষে তিরস্কার করেন। ফলে অগ্নিদগ্ধা শালাজের শেষ কথা আর মৌলবির কটাক্ষ তাকে বিচলিত করে। কেননা তিনি বুঝতে পারেন ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ জাতির বাইরে তিনি নন। ইন্দ্রয়াসক্তির উপর আরোপিত নিষ্ঠাচার মসৃণ জীবনাচরণ বিশ্লেষণান্তে পণ্ডিতের ভাবনালোককে বিষময় করে তুলেছে। চিন্তন-চিহ্ন যুক্ত এই ভাবনারাজি আলো ফেলেছে পণ্ডিতের মনোগহনের গলিপথে। বিপত্নীক শ্যালক আবার বিয়ের জন্য প্রস্তুত– এই তথ্য পণ্ডিতের চিত্তে নিয়ে আসে মোক্ষম আঘাত। নিমন্ত্রণপত্র হারানোর ভাব করে পণ্ডিতজি যেন জেনেশুনেই করতে চান 'বক ধার্মিকের প্রথম মিথ্যাচার'। এভাবে মনোলোকের নিগূঢ় ভাবনা উন্মোচনে গল্পকার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

একাগ্র প্রেমের অচ্ছেদ্যতার এক মর্মগ্রাহী রূপায়ণ 'চকাচকী'। এ গল্পে 'উগ্র কামনার তীব্রতা নেই, আছে শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমের প্রায় অনুচ্চারিত এক মাধুর্য।'[১১] বিশ্বনিন্দুক কানা মুসাফিরলাল 'চড়ুই চড়ু ইনী' বললেও প্রেমের একাগ্রতা ও আত্যন্তিকতার ব্যঞ্জনাকে বোঝাতে লেখক দুবে ও দুবেনীর যুগলবন্দিকে বলেছেন– চকাচকী। রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য তারা যথাসর্বস্ব খরচ করে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ডামাডোলে থানার দারোগা দুবেনীকে জেলে পুরে দেয়। কিন্তু 'বাহাত্তুরে বুড়ো' বলে নিষ্কৃতি পায় দুবেজী। অনেক চেষ্টা করেও দুবেজী জেলে যেতে না পারলে দুবেনী সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কোন অনৈর্দেশ্য পাপমোচনের জন্য তাদের প্রাত্যহিক রাম-উপাসনা বেড়ে যায়। ক্রমশ বয়োত্তীর্ণ অথর্ব অসহায় দুবেজীর পথ্য জোগাড়ের জন্য দুবেনীকে চেনা পরিচিতের কাছে হাত পাততে হয়। পরিচিত অনেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও সহৃদয় গল্পকথক তা পারে না। চকাচকীর জন্য তার হৃদয়ে ছিল প্রবল সম্ভ্রম, শ্রদ্ধাবোধ ও কৌতূহল। দুবেজীর মৃত্যুর প্রাক্কালে হঠাৎ উন্মোচিত হয় প্রকৃত ঘটনা। দুবেনীর স্বীকারোক্তিতে জানা যায় দুবেজী তার বিয়ে করা স্বামী নয়। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, কিন্তু কোনো একদিন প্রেমের টানে দুবে দুবেনী সংসারের প্রচলিত কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়েছে। সেদিনের সেই প্রেমে ভাটা পড়েনি দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যবধানেও। কিন্তু মনোগহনের গভীর অন্তরালে তীব্র অপরাধবোধ তাদের দগ্ধ করে। ফলে পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা নেই বরং পাপমুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাদের এই অতিথি সৎকার, কারাবরণ এসবের মধ্য দিয়ে তারা শাপমুক্তি কামনা করে। তাই সাহায্যের অর্থে ঔষুধ-পথ্য না কিনে গোদান পর্যন্ত করে। দুবে দুবেনীর এই প্রণয়ে অভিভূত লেখকের ভাবনা :

> ...দুবেনীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাপ মোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। টাকা দিলাম ঔষধ-পথ্যের জন্য খরচ দিল গো দানে! আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ঔষুধ পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল!... এদের মনের নাগাল পাওয়া দায়![১২]

দুবেনীর একান্ত অনুরোধে গল্পকথক দুবেজীর ছেলেকে কৌশলে নিয়ে আসে। সেই নিকট আত্মীয়ার মৃত্যু সংবাদ আর টিনের বাড়ির কথায় প্রলুব্ধ হয়ে সেই পুত্র আসে দুবেজীর অন্তিম সংস্কার করতে। নিজের সন্তানের হাতে মুখাগ্নিটুকু যাতে পায়, সেজন্য মৃত্যু পথযাত্রী দুবেজীর শিয়র থেকে পালিয়ে যায় প্রণয়িনী নারী– দুবেনী। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোপনে দেখে প্রিয়জনের শেষযাত্রা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্নদাদিদি চরিত্রটির সঙ্গে দুবেনির খানিকটা সাদৃশ্য আছে। তবে অন্নদাদিদির প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ নীতিশাস্ত্রসম্মত, কিন্তু দুবেনীর সর্বস্ব ত্যাগ অশাস্ত্রীয় প্রেমের জন্য। দুবে-দুবেনীর এই অবৈধ প্রেমের পূণ্যস্পর্শে কানা মুসাফিরলালের অন্তরেও আসে পরিবর্তন। তাই দুবেজীর ছেলের উৎকণ্ঠ সংশয়কে নির্জীব করে সে বলে ওঠে 'শিয়াল-টিয়াল হবে' বোধ হয়। 'আপাতদৃষ্টিতে বহমান এই জীবনের তলে তলে কোথায় লুকিয়ে থাকে অবৈধ প্রেমের চোরাস্রোত'[১৩]– লেখক এখানে সেই মুহূর্তেরই সন্ধানী। প্রেমের একাগ্র আন্তরিকতায় দুবে-দুবেনীর সম্পর্ক উর্ধ্বায়িত হয়ে যায় নিতান্ত সামাজিক ছুৎমার্গের বলয়কে অতিক্রম করে পাপমুক্ত পূণ্যলোকে।

অন্তর্লীন মন্ময়তার স্পর্শে এক অপূর্ব দুরূহ ছোটগল্প 'একটি কিংবদন্তীর জন্ম'। আটপৌরে জীবনের বাইরে মানবহৃদয়ের অতলান্ত রহস্যের জগতের আপাত অপ্রকাশমান কার্যকারণ বর্ণনার জন্য এর ভাষা স্বভাবই সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নত্তরঙ্গী চৌবে বিহারের এক গ্রামের বাসিন্দা। সাধারণ মানুষ থেকে সম্পন্ন সরকারি কর্মচারী কেউই তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় না। উচ্চবিত্ত এই ভূস্বামী স্বয়ং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে শিকারে যায়। শুধু উপার্জন নয় জীবনে ভোগ-বিলাসও করেছে প্রচুর। প্রাসাদ প্রমাণ অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও চৌবে তার পৈতৃক খাপড়ার বাড়ি 'ভিটে বাংলা'য় থাকত। বিনা অনুমতিতে সেখানে কেউ যেতে পারত না। অসুস্থ হবার পর জীবনের অন্তিমে এসে হঠাৎ দানশীল চৌবে সবকিছু বন্ধ করে দেয়। মারা যাবার পর চন্দন কাঠে ঠাসা ভিটে বাংলা সমেত তাকে পুড়িয়ে চৌবের মৃত্যুকালীন বাসনা। নাওরঙ্গী চৌবে দানের ট্যাক্স সরকারকে যথারীতি বুঝিয়ে দিয়ে গোপনে দান করত। আপন ভিটা দহনের মাধ্যমে হয়ত সে দানসাগরের স্রোতের উৎসমুখ গোপন করতে চায়। এভাবেই তার দানশীলতার রহস্য হয়তো চিরদিনের জন্যই অনুন্মোচিত থেকে যাবে; আর তাতেই সৃষ্টি হবে নতুন কিংবদন্তি। লেখক অতি সংযতভাবে ভূস্বামী পরিবারের ধন ঐশ্বর্য ও বিলাস ব্যসনের চিত্র অঙ্কন করেছেন এই গল্পে। দগ্ধ ভিটে তাই তাঁকে নিয়ে যায় কল্পনার জগতে:

> ... ধোঁয়ার সুবাস, আগুনের উত্তাপ আর মনের আবেশের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে একটি নূতন কিংবদন্তির বীজকণা। ... আগুন নিভলে পুরুষরা এই ছাই আঁজলা ভরে ভরে নেবে; মেয়েরা নেবে আঁচলে বেঁধে; মায়েরা ঠেকাবে ছেলের কপালে।... 'এত টাকা কোথা থেকে আসত?– এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছে তারা...'[১৪]

অতীতের বিলাসী জীবনের যাপিত অভ্যাসের প্রতি মোহময়তার যৎকিঞ্চিত বিবরণ খুব সহজেই চৌবে চরিত্রের নির্মোক উন্মোচন করে তার চরিত্রের সাংঘর্ষিক অনুষঙ্গসমূহ সৃষ্টি করে এক ইন্দ্রজাল, যার মধ্যে নিহিত থাকে নত্তরঙ্গী চৌবের আত্ম-সমীক্ষণের অপ্রত্যক্ষ বাস্তবতা। এই রহস্যের ঘোর অন্তরালে চৌবে হয়ে ওঠে দানসাগর; কিংবদন্তির বিস্ময় নায়ক।

মনোবিকারের নিপুণ ও নির্মম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'বাহাত্তুরে' অনন্য এক ছোটগল্প। কুসংস্কার ও অবান্তর বাতিকগ্রস্ততায় ত্বরান্বিত মৃত্যু ও তৎপূর্ববর্তী মহাজন শ্রীদাম সাহার মানস জটিলতা এই

গল্পের উপজীব্য। 'আপাতসুখী ও সমৃদ্ধ দাম্পত্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা চরম অধিকারবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও কর্তৃত্বকে 'বাহাত্তুরে' গল্পের শ্রীদাম সাহা চরিত্রের সংস্কারের আবরণে সকৌতুকে উদ্‌ঘাটন করেছেন গল্পকার।'[১৫] কৃপণ ধনী বাহাত্তর বছর বয়সী এই ব্যক্তি সংসারের কর্তৃত্ব নিজের হাতেই রাখেন এবং তার ভালমন্দের প্রতি সবার সার্বক্ষণিক সুদৃষ্টি আশা করেন। এগারো সন্তানের জননী তার স্ত্রী হাঁপানিতে আক্রান্ত হলেও স্বামী সেবার ত্রুটি করেননি কখনও। পুত্রের বন্ধু নরেন ডাক্তারের পরামর্শে মেটে সিঁদুর ব্যবহার করতে গেলে বিপত্তি বাধে। সিঁথিতে সিঁদুর না পরায় অভিমানের প্রাক্কালে শ্রীদামবাবু হার্টের রোগে আক্রান্ত হন। সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও অমঙ্গলের সূত্র যে তার স্ত্রীর অবহেলা তার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। তার মনের গহনে তোলপাড় চলে :

> তাঁর অসুখ ও সৃষ্টিধরের মায়ের আসল সিঁদুর মোছার মধ্যে সম্পর্কটি সবচেয়ে নির্বুদ্ধি লোকেরও নজরে পড়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে আর ডেকে তুলবে কি করে! ওরা সব জানে! সব বোঝে! বুঝে না বোঝবার ভান দেখায়![১৬]

সমস্ত ক্ষোভ অভিমান, দুঃখবোধ তাকে প্রবলভাবে বিচলিত করে তুলল। তার স্ত্রী যখন শ্রীদামের মনোবেদনা বুঝতে পেরে অমঙ্গলের আশঙ্কায় মেটে সিঁদুর মুছে আসল সিঁদুর পরতে গেলে শ্রীদামের মনোগহনে তখন তৈরি হলো জীবননাশী সংকট-মুহূর্ত। সিঁদুর বদলানোর ক্ষণিক ব্যবধান মুহূর্তে কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত আবর্তে তার মৃত্যু ঘটে। আপাত সরল এই গল্পের অন্তরালে নিপুণ বর্ণনায় বৃহৎ এক পরিবারের কর্তা শ্রীদামবাবুর অসহায় মনোবিকার বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্ব বিস্ময়কর।

মানবমনের বিচিত্র গতি অনুধাবন করে তার এক প্রত্যন্ত কোণের অনুসন্ধানের সমীকরণ 'জলভ্রমি'। মুর্শিদকুলি খাঁর হাবসী সৈন্যদের বংশধর অসাধারণ বিক্রমশালী পুরুষ হাসানু শীর্ষাবাদিয়া। বার্ধক্যে পঙ্গু-প্রায় হলেও দ্বি-চারিণী পুত্রবধূকে হাতেনাতে ধরার জন্য তার ঝিমিয়ে পড়া হাবসী শোণিত চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধানী বৃদ্ধ চিথরিয়া পীরের বিরাট গাছের তলায় ছেলে, ছেলে বৌ আর সেই লম্পটকে বাঁচার যৌথ সংগ্রাম করতে দেখে। তাই দেখে হাসানুর হাতের মুঠি শিথিল হয় হেঁসোদার হাতলে। সে 'চিথরিয়া পীরের আকাশে বাতাসে গঙ্গার বালুচরে পরিচিত গন্ধ' অনুভব করে। পরিবেশের প্রভাবে বদলে যাওয়া হাসানু চিন্তা আর স্বগতোক্তির মাধ্যমে পৌঁছে যায় তার অতীত জীবনে। মনস্তত্ত্বের এরূপ আশ্চর্য গতি প্রকৃতি গল্পে বিন্যস্ত করে এক অপূর্ব স্বাদ।

এক ধর্মান্ধ বৃদ্ধের বিশ্বাস ও স্বপ্নভ্রষ্টতার সুনিপুণ বিশ্লেষণ 'ব্যর্থ তপস্যা'। স্বীয় বংশে শেষ অবতার কল্কিদেবের আবির্ভাব ঘটবে এই বিশ্বাসে পাঞ্জাবের ধর্মান্ধ বৃদ্ধ চতুর্বেদি তার নাতির নাম রাখে কল্কিদেব। পুরাণে বর্ণিত কাহিনি অবলম্বনে পাঞ্জাবের সম্বল গ্রাম অনুন্ধান করে বৃদ্ধের পিতা গঠন করেছিলেন কল্কি সম্প্রদায়। আর বৃদ্ধ কল্কিদেবের আগমনের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিশুসন্তান কল্কিকে শস্ত্র ও শাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলে। কিন্তু দেশবিভাগের কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সবাইকে হতাশ করে তাদের বহু প্রত্যাশিত অবতারের অপমৃত্যু ঘটে। এর ফলে ভ্রমাত্মক আদর্শে অনুপ্রাণিত এক সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের তপস্যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবুও বৃদ্ধ নিজের কাঁধেই বয়ে চলে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সমাপ্তির ভার। বৃদ্ধের ধারণা তার বংশধর কল্কিদেব নিশ্চয় লড়াই চালিয়েই যাচ্ছে। তার হৃদয়ে দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস ও সংশয়ে দীর্ণ হয়ে ওঠে; জলে চোখ ছল ছল হয়ে ওঠে। কারণ 'হৃদয়কে উপবাসী' রেখে সে নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি-সার্থকতায় আস্থাশীল হতে পারে না। হয়তো বিশ্বাস আর সংশয়ের এই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধের হৃদয়ে কাজ করে চলে নিরন্তর।

জাঁদরেল মহিলার স্বামী-পীড়ন, স্বামীর আত্মহনন থেকে অপরাধবোধ এবং তজ্জাত আতঙ্ক এবং তা থেকে মুক্তির এক অভিনব মনোঃসমীক্ষণ 'কম্যান্ডার-ইন-চীফ'। মিস্টার মুখার্জীর পরোপকারিতাকে সহ্য করতেই পারত না মিসেস মুখার্জি। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরেই মুখার্জী আত্মহত্যা করে। এই সত্যটি প্রকাশের ফলে সকলের চোখে হেয় হবার আশঙ্কায় শোকের মধ্যেও নিজেকে বাঁচাতে তৎপর হয়ে মিসেস মুখার্জী স্বামীর মৃত্যুর জন্য তার শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যেই বিলাপ করতে থাকে। মুখার্জীর স্ত্রী, কন্যা এমনকি বিশ্বস্ত কর্মচারী সুনরা প্রত্যেকেই পরস্পরকে লুকিয়ে টাকার আলমারি খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাধ ও আতঙ্কে সকলেই ব্যর্থ হয়। তাদের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার পেছনে অসৎ ও হৃদয়হীন মানসিক বিকৃতি অনেকাংশে দায়ী। মিসেস মুখার্জী চরিত্রটি বহুলাংশে শেক্সপিয়রের *ম্যাকবেথ* নাটকের লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। লেখকের নিরাসক্ত ও চাপা বিদ্রূপময় পরিবেশনায় মিসেস মুখার্জীর লোভ ও ইতরতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মিথ্যা অভিজাত্যের অহংকার মানুষকে কতোটা কৃত্রিম করে তুলতে পারে এ গল্পটি তারই এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে ঘটে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে নারী মনের জটিলতন্ত্রীর সহজ উন্মোচনের গল্প 'পরিচিতা'। বিহারের পটভূমিতে রচিত এ গল্পে প্রশান্ত ও তার স্ত্রীর অভাবের সংসার। এই সংসারে শৈলর একমাত্র সম্বল স্বামীর ভালবাসা। যেকোনো মূল্যেই সে তা ধরে রাখতে চায়। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু চাঁপা স্বল্প বেতনে প্রশান্ত-শৈলর বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে পুরাতন ঝি হিন্দুস্তানি গুলটনের মার পরিবর্তে। অম্বল রোগে শারীরিক দুর্বলতার সূত্রে শৈলর মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নিতান্তই কৌতুকবশত প্রশান্ত একদিন রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনে কুলকুচি ছিটিয়ে রাখে। এতে করে পরদিন চাঁপার বাসন মাজতে সুবিধা হয়। চাঁপার প্রতি গৃহকর্তার এরূপ সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হীনমন্য শৈল তার দাম্পত্য জীবনে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। সে চাঁপাকে কাজ থেকে সরিয়ে আবার গুলটনের মাকে পুনর্বহাল করে। আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রীর সন্দেহগ্রস্ততার লঘু হাস্যরসের মধ্য দিয়ে 'নারী মনের অপার দুর্জ্ঞেয়তাকে অতি সহজেই লেখক প্রকাশ করেছেন।'[১৭] অভাবী সংসারে দাম্পত্য সুখ ও বিশ্বাস নারী মনের জটিলতাজাত মনোবিকারে সন্দেহ আর অবিশ্বাসে রূপান্তরের নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। সতীনাথ ভাদুড়ীর এইসব গল্পে মানবহৃদয়ের বিচিত্র বক্রগতি সার্থকভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে।

আধুনিক সময়ে মানব-সম্পর্কের জটিল রহস্য ও বহুমাত্রিক অসঙ্গতি কথাগ্রন্থনায় উন্মোচন করেছেন সচেতন ভাষাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী। মানুষের মনোগহনের অনাবিষ্কৃত জটিল রহস্য উন্মোচনে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক লেখকদের মতোই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি। সমাজব্যবস্থার অন্তহীন জটিল বিন্যাসের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় মানবমনে সৃষ্ট নিগূঢ় মানসকূট তাঁর গল্পে অবধারিত অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সমাজ ও সমকালসম্ভূত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে সমকালীন জগৎ ও জীবনের বহুমুখী জটিলতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর কথাসাহিত্যের এই সমীক্ষায় সমাজ ও মানবহৃদয়কে অন্তরঙ্গরূপে চেনার দুর্লভ সুযোগ মেলে। সময়ের সঞ্চিত ঐতিহ্য ও প্রবণতা লেখকের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে ছিল নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যুগের চিন্তা ও উপলব্ধি সাহিত্যকর্মের মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করে তাঁর শিল্পরীতিতে অঙ্গীভূত হয়েছে। বৃহত্তর সমাজবোধে ভাবিত সতীনাথ ভাদুড়ী মানুষের প্রতি সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি আত্ম-সর্বস্ব মানুষের নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যকে তিনি হাস্যকৌতুকে বিদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ-রসাত্মক সাহিত্যকর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রখর বুদ্ধি, সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের নানা অসঙ্গতিতে আক্রান্ত মানব-মনস্তত্ত্বকে যথার্থই চিত্রায়িত করেছেন গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী; সংযত ভাষ্যে– শৈল্পিক নিরাসক্তিতে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ২০৬

২. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'চরণদাস এম.এল.এ', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, শঙ্খঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.) (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৯), পৃ. ৩০৩

৩. স্বস্তি মণ্ডল, *সতীনাথ ভাদুড়ী* (কলকাতা : সাহিত্য আকাদেমি, ২০১০), পৃ. ৬১

৪. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'পত্রলেখার বাবা', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

৫. তদেব, পৃ. ৩৬২

৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'মহিলা-ইন-চার্জ', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

৭. শচীন বিশ্বাস, 'সতীনাথের ছোটগল্প', *সতীনাথ স্মরণে*, সুবল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.) (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ২০১৩), পৃ. ১৫৮

৮. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'পদাঙ্ক', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৬

৯. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'বয়োকমি', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮

১০. শিবশঙ্কর রায়, 'বৈয়াকরণ : মানসিক ব্যাকরণের কথকথা', *গল্পচর্চা*, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.), (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮), পৃ. ৬৩৯

১১. শ্রাবণী পাল, 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প : একটি সমীক্ষা', *দিবারাত্রির কাব্য*, আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা (কলকাতা, ২০০৫), পৃ. ৪১৪

১২. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'চকাচকী', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

১৩. শ্রাবণী পাল, 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প : একটি সমীক্ষা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭

১৪. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'একটি কিংবদন্তীর জন্ম', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২

১৫. দেবকুমার সাহা, 'সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প : একটি সমীক্ষা', *পদক্ষেপ*, জ্যোতির্ময় দাশ ও অসীমকুমার বসু (সম্পা.) বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৩৯, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৫

১৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'বাহাত্তুরে', *সতীনাথ রচনাবলী* ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯

১৭. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, *সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৩৯১), পৃ. ২০৩